ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1553-1563
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.164

‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ (১৯৪৪): মুন্ডাসমাজের নতুন সংকট

দীননাথ সরদার, *সহকারী শিক্ষক, বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির (উচ্চমাধ্যমিক), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.07.2025; Accepted: 26.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The jungle is the mother of the Mundas, the jungle is the motherland of the Mundas. Just as the whole of India is the wealth of life for the Indians, the wealth dearer than life for the Mundas is their jungle, and the jungle is their India for the Mundas. Just as the Indians cannot accept an intruder entering India, the Mundas cannot accept that intruder in any way, similarly, if an outsider or an upper caste or a missionary enters their own jungle and tries to disrupt the lives of the Mundas, the Mundas do not accept it in any way. The Mundas collect their daily food by hunting the fruits, animals and birds of the poor and helpless forest. During festivals, they drink mahua liquor in the Palapar forest and take Madal. Runnu Horo is a Munda child. His parents, in order to free him from his daily life of poverty and helplessness, admit him to the mission. Wild animals can be taken from the forest and kept wherever they want, but the forest can never be taken from the human mind. Stephan Horo came out of his Munda life and became a Christian in the mission and became a Munda young man. But the old friend went to the mission carrying the smell of the soil. And in the jungle of Morangi, the love of Chirki Murmu initially wants to take Stephan Horo, who has become a Christian, back to Munda' s life. But jealousy towards Father Lyndon forces the old Stephan Horo to abandon the Munda young man.
Keywords: Munda, Birsait, Runnu Horo, Forest Rights, Freedom or Independence, Missionary

মুন্ডারা যেমন বিনম্র তেমনি আবার বিদ্রোহী। মুন্ডারা আবার স্বাধীনও। মুন্ডাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কোন ভয় নেই। ভারতবর্ষে আর্যদের অনুপ্রবেশ এর মাধ্যমে দু'হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হতে হয় ভারতবর্ষীয় এই অনার্যদের তথা আদিবাসী মুন্ডাদের। আর্যদের পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা ছাড়া অন্য কোন ভারতবর্ষীয় শাসক এই মুন্ডাদের ‘অরণ্যের অধিকারে’ হস্তক্ষেপ করার মতো দুঃসাহস দেখায়নি। ভারতীয় সমাজ এবং সভ্যতায় মুন্ডাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই দীর্ঘদিনের। মুন্ডাদের হাজার হাজার বছরের লড়াই বিরসা মুন্ডার ‘মুন্ডাবিদ্রোহে’র মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসে মুন্ডাদেরকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। বিরসা মুন্ডা সমগ্র আদিবাসী সমাজের মধ্যে এমন একজন যোদ্ধা যার আন্দোলন এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতীয় পার্লামেন্টে একমাত্র ভারতীয় আদিবাসী হিসেবে বিরসা মুন্ডার ছবি স্থান পেয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম বিরসা মুন্ডার জীবনী গ্রন্থ ‘বিরসা ভগবান’ (১৯৫১)। জীবনীকার হলেন মুচিরাই মুন্ডা। এরপর কুমার সুরেশ সিং লেখেন ‘Dust Storm and Hanging mist’ (1966) বইটি, পরবর্তী সময়ে এই বইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং নাম পরিবর্তন করে নাম ‘Birsa Munda And His Movement’ (1874-1901) রাখেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিরসা মুন্ডাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখেন মহাশ্বেতা দেবী ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭)। বিরসা মুন্ডাকে কেন্দ্র

করে মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। উপন্যাসটি ১৯৭৯ সালে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।[১] বিরসা মুন্ডাকে কেন্দ্র করে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হলেও মুন্ডাদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এটি প্রথম রচনা নয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে মুন্ডা সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেন সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ (১৯৪৪) গল্প। ব্রিটিশ ভারতের তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাওলাট আইন পাস হলে, ভারতের ভাইসরয় ও ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল এই রাওলাট আইনকে সারা ভারতবর্ষে বলবৎ করে। এই আইনের বলে ভারতবাসীর উপর কঠোর দমনমূলক শোষণ মূলক নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। সাধারণ ভারতবাসীর বেঁচে থাকার ন্যায় বিচার কে লঙ্ঘিত করা হয়। সামান্য ন্যূনতম প্রমাণপত্র দাখিল ব্যতিরেকেই ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশ কর্মীরা সাধারণ ভারতীয় জনসাধারণকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে দেয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ান ওয়ালাবাগে একটি বিশাল জনতা একত্রিত হয়েছিল। সেখানে জেনারেল রেজিনাণ্ড ডায়ারের নেতৃত্বে কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার এবং তার সৈন্য নিয়ে ঘটনার স্থলে উপস্থিত হন। সেখানকার একমাত্র বাইরে বেরোনোর পথ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ডায়ার তার অফিসার এবং সৈন্যদের নিরস্ত্র ভারতীয় জনতার উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এক অমানুষিক হত্যাকান্ড চালিয়ে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়। ইতিহাস একেই ‘জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড’ নামে চিহ্নিত করা হয়। এই ‘জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে’র প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘নাইট’ উপাধি পরিত্যাগ করেন। এর ফলশ্রুতিতে মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী অহিংস গণআইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় যা অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত এবং এই আন্দোলন অহিংস গনআইন অমান্য আন্দোলন গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধী যুগের সূত্রপাত ঘটায়।[২]

ব্রিটিশ শাসনাধীন পরধীন ভারতবর্ষের এমনই এক সংকটময় পরিস্থিতিকে সময় কাল হিসাবে তুলে ধরে গল্পকার সুবোধ ঘোষ ‘বিরসা মুন্ডা’ পরবর্তী মুন্ডাসমাজের নতুন এক সংকট ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পটি রচনা করেন। গল্পটির সূচনা পর্বে আমরা লক্ষ্য করি উত্তম পুরুষের মিস্টার ঘোষ এই গল্পের সূত্রধর। ঘোষের ক্লাসটা ছিল ঠিক যেন নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরির মত। বিচিত্র মানবতার নমুনা অন্য কোন স্কুলে আর এমন ভাবে ছিল না। তিনটি রাজার ছেলে একই ক্লাসে পড়াশোনা করতো। একজন জংলি রাজার ছেলে কুচকুচে কালো আর দুজন সত্যি কারের ক্ষত্রিয়, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। কিছু ধর্মান্তরিত সাঁওতাল এবং আদিবাসী ছেলেরা ও একই সঙ্গে পড়াশোনা করতো, তারা হলেন সিরিল তিগগা, ইম্যানুয়েল খালখো, জন বেসরা, রিচার্ড টুডু, স্টিফান হোরো আরও অনেকে। এত ওরাও আর মুন্ডা সন্তানদের মাঝখানে বাঙালি ও বিহারী ছেলেগুলো শুভ বুদ্ধির জোরে সব বিষয়ে মোড়লের গৌরব অধিকার করে বসেছিল। রাজার ছেলেগুলোকে তারা বলতো সোনা ব্যাঙ আর মুন্ডা ও ওরা ওদের ছেলেদের বলতো কোলা ব্যাঙ। রাজার ছেলেরা সবার সঙ্গে কথা বলতে চাইতো না। অন্যদিকে তিগগা, খালখো, বেসরা, টুডু ওরা বাঙালি ছেলেদের সাথে কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় টুডুকে একটা আনি দিয়ে ঝালবাদাম আনতে দেড় মাইল দূরে দৌড় করানো যেতো। আর কেউ বাঙালিদের এই কারসাজিটা ধরতে না পারলেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতিব্র দৃষ্টিতে স্টিফান হোরো সমস্ত কিছু ধরে ফেলতো। সবার মধ্যে একমাত্র স্টিফান হোরোই পারে, এই চতুরতাকে ধরে ফেলতে আর কোনও আদিবাসী ছাত্ররা পারেন। তিগগা,খালখো, বেসরা, টুডু এরা সকলেই বাধ্য নিরীহ এবং বিশ্বাসী ছিল। সবাই এদেরকে নিয়ে মনে মনে হাসতো আর বলতো হায়রে “রাঁচির জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ।”[৩] ওদের মধ্যে ও একটিমাত্র ‘কালকেউটে’ ছিল স্টিফান হোরো। মুন্ডা যুবক স্টিফান হোরোর স্বভাবটা বড় ঔদ্বত্ত পূর্ণ ছিল। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে বাঙালি ও বিহারী ছাত্রদের ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। ওই মাথা ঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙর চ্যাপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা, তোর এত অহংকার। স্টিফান হোরোর উপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হলো একটা ঘটনায় পর। সেদিন খেলার মাঠে মুন্ডাছেলে স্টিফান হোরো হকি স্টিক আনেনি। স্টিফান হোরো তবু হকি খেলা করতে চায়। কেউ যখন তাকে একটা স্টিক ধার দিতে চাইনি তখন স্টিফান হোরো বললো, আমি বিনা হকি স্টিকে খেলবো। গোয়ার স্টিফান হোরো এক ঘন্টা উদ্দাম হকি স্টিকের বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দে পা দিয়ে খেলে দিব্যি হকি খেলে গেল। স্টিফান

হোরো ক্রমশই সবাইকে ভাবিইয়ে তুলেছিল। স্টিফান হোরোকে সব ছাত্রেরা একটা সময় পর ঈর্ষা করতে আরম্ভ করল কারণ, লেখাপড়ার বিষয়ে স্টিফান হোরো সমস্ত ছাত্রদের মনের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে ইন্দুকে পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পেল, ঘটনাটা আর্য ছাত্রদের গায়ে জাতীয় অপমানের মতো বিঁধলো করলো। স্টিফান হোরো সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে বাঙালি ও বিহারী ছাত্ররা একসঙ্গে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠন করলো। তারা জোর গলায় রটিয়ে দিল এই স্কুলে অক্রিস্টান ছাত্রদের উপর বড়ই অবিচার চলছে। কারণ মাস্টাররা সবাই খ্রিস্টান। তাই ইংরেজি বিষয়ে সবাই স্টিফান হোরোকে ইচ্ছে মতো বেশি নম্বর দিয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার পর নতুন ক্লাসে উঠে স্টিফান হোরো আরো এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসলো, যা পা দিয়ে হকি খেলা চেয়েও ভয়ংকর। স্টিফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরেজি ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। এতে সংস্কৃতের পন্ডিত সহ সমস্ত বাঙালি ও বিহারী ছাত্ররা মুচকি হাসলো। কিন্তু পড়াশোনায় ভালো ছাত্র পাওয়ার জন্য পণ্ডিত মশায় গোপনে খুশি হলেন। খ্রিস্টান শিক্ষকেরা সবাই স্টিফান হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিন্ডন সাহেবও ক্ষুন্ন হলেন।[৪] নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিড এর গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফাস্ট প্রাইজ পেল স্টিফান হোরো। ফাদার লিণ্ডন উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্টিফান হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন- ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর স্টিফান হোরোকে থানার দারোগা করে দেবেন। এর জন্য ঘোষ এবং অন্যান্য ছাত্রেরা স্টিফান হোরোকে হিংসা করলেন না, তারা ভাবলেন এই যদি স্টিফান হোরো জীবনের পরম লক্ষ্য হয় তা হোক। তারপরের দিন বাইবেল ক্লাসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্টিফান হোরো একেবারে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল। ফাদার লিন্ডনের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে চাইনি। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে সে উত্তর দিয়েছিল, জানিনা স্যার। ফাদার লিন্ডনের দিকে যেন তাকাতে চায় না মুন্ডা ছাত্র স্টিফান হোরো। এরপর ফাস্ট টার্মিনাল পরীক্ষা শেষ হয়। সংস্কৃতের পণ্ডিতজির কাছে সবাই জানতে পারে স্টিফান হোরো সংস্কৃতে একশোর মধ্যে পেয়েছে পঁচাত্তর। পন্ডিতজিও মেধাবী একজন ছাত্রকে পেয়ে খুব খুশি। আর ইন্দু পেয়েছে মাত্র বত্রিশ। সব ছাত্ররা পন্ডিত মশাইকে বিশ্বাসঘাতক রূপে প্রতিপন্ন করলো। পণ্ডিতজি মিনতি করে সবাইকে বলেন, স্টিফান হোরোর মতো একটা মুন্ডাছেলে সংস্কৃতে এত ভালো লিখেছে, সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে, এতো তোমাদেরই গৌরব, আর্য ভাষার গৌরব। এ জয় একা স্টিফান হোরোর নয় এটা সংস্কৃত ভাষার জয়। তখন সব ছাত্ররা ভাবে চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ক্লাসে ফার্স্ট হতে না পারলে এটা যে আর্য সভ্যতার কত বড় পরাভাব, বাঙালির কত বড় অপমান পন্ডিতজি তা বুঝবেন না কারণ, পণ্ডিতজি হলেন বিহারী। কিন্তু সব হিসেবকে ভুল প্রমাণ করে ইন্দুই ক্লাসের মধ্যে প্রথম হলেন। মুন্ডাদের ছেলে স্টিফান হোরো একেবারে সবার নীচে। ইংরেজিতে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অংকে, সব বিষয়ে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টিফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। সমস্ত ছাত্রদের অবাক করে দিল স্টিফান হোরোর এই ফলাফল। খ্রিষ্টান ছাত্রদের কাছেও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে স্টিফান হোরো তারাও বলাবলি করছে কি জানি কি হয়েছে স্টিফান হোরোর।

বড়দিনের ছুটিতে সব ছাত্ররা মিলে পিকনিক করতে গিয়েছিল শিলোয়ারার জঙ্গলে। সবাই যখন রান্নার কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত তখন হঠাৎ ঘোষ দেখলো স্রোতের পাশ থেকে স্টিফান হোরো একা একা হেঁটে চলেছে। হাতে তার একটা গুলতি। সবাই চেঁচিয়ে স্টিফান হোরোকে ডাকলো, সবাই ভাবলো অযাচিত ভাবেই যখন স্টিফান হোরো এসেই পড়েছে তখন সেও সবার সঙ্গে বনভোজনের একটু আনন্দ নিক। পোলাও, মাংস, দই, বৈকুণ্ঠ ময়লার সন্দেশ এসব পেলে বড় খুশি হবে স্টিফান হোরো। একেবারে বন্য মুন্ডাজীবনে বোধহয় এসব কোনদিন খাইনি। স্টিফান হোরো ডাক শুনে তাদের কাছে আসলো কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল শাল গাছের শাখায় তারপর শিকার লক্ষ্য করে গুলটি ছুড়লো সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালি আহত হয়ে মাটিতে পড়ল। স্টিফান হোরো আহত কাঠবিড়ালিটিকে লুফে নিয়ে তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। স্টিফান হোরো সব বন্ধুদেরকে সে জানালো সে ওটা খাবে। সে পিকনিকের ওই খাবার খেতে চায় না। সবাই মনে মনে ভাবল দিন দিন স্টিফান হোরো কেমন জংলি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মনে হয় পাগল হয়ে যেতে পারে। ফাদার লিন্ডন সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে। যাতে স্টিফান হোরোর সঙ্গে আর কেউ মেলামেশা না করে। ব্যাপারখানা কি তা জানার জন্য সবাই মিলে টুডুকে ধরলো। টুডু সবাইকে জানালো, স্টিফান হোরোর বেশ কিছুদিন ধরে বুড়ো সোখার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতি মঙ্গলবার হাটে গিয়ে স্টিফান হোরো সোখার সঙ্গে দেখা করে। খ্রিস্টান ছাত্রেরা মনে করে, এতে বাইবেলের

অপমান করেছে স্টিফান হোরো। চার্চে যায় না, কারো কথা শোনে না মাঝে মধ্যে বোডিং থেকেও দু-তিন দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। টুডু গলার স্বর নিচু করে বলে স্টিফান হোরো বুরুতে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে নাচ গান করে এসেছে, পেট ভরে ইলি মদ খেয়ে নেশা করেছে। আরেকটা মুর্মুদের মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে স্টিফান হোরো, মেয়েটার নাম চিরকি মুর্মু। মেয়েটা ওই মোরাঙ্গি পাহাড়ে থাকে।[৫] টুডুর কথাগুলো সবাই মিলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। তাদেরই এক সহপাঠী দিন-দরিদ্র মুন্ডা স্টিফান হোরো, কতই বা তার বয়স। বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতির নম্বর আর হকি খেলার আনন্দকে উত্তেজনাকে এক মুহূর্তে মূল্যহীন করে দিয়ে এক রোমাঞ্চকর অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটা যার নাম চিরকি মুর্মু, তাকে সবাই আপন আপন কল্পনাই দেখতে পাচ্ছে। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোপা একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মতো খল খল হাসির মধ্য দিয়ে স্টিফান হোরোর কালো হৃদয় কে দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে বন্দী করে কোন অজানা উপত্যকার গহীনে চলে গেছে। এই বন্ধনের আগলকে ছিন্ন করে স্টিফান হোরো আর ফিরে আসতে পারবে না। টুডু তখনো বলে মুর্মুরা বোঙা পূজা করে। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে স্টিফান হোরো খুব ভুল করেছে।

স্টিফান হোরোকে বোডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এমন একটা গুজব উঠলেও কার্যত তাকে বোডিং থেকে তাড়ানো হয়নি। স্টিফান হোরো নিজের ইচ্ছামত ক্লাসে যায় আসে, অনুগত খ্রিস্টান ছেলেরা তাকে এড়িয়ে যায়। ‘স্টিফান হোরো যেন এক ঘরের মধ্যেই এক ঘরে হয়ে যায়।’ ফাদার লিন্ডনের আদেশ মতে স্টিফান হোরোর উপরে থেকে সব শাসন তুলে নেওয়া হয়েছে। সব ছাত্ররা একদিন অবাক হয়ে দেখল ফাদার লিন্ডন টেনিস খেলছেন স্টিফান হোরোর সঙ্গে। খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী স্টিফান হোরোর চেয়ে কম কালো ছেলে, টুডু, বেসরা, টিগগা- এরা আজ পর্যন্ত ফাদারের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেওয়ার মর্যাদাটুকু পেয়েছে। তার থেকে বেশি নয়। আর কালো মুন্ডা ছেলে স্টিফান হোরো একেবারে ফাদার সঙ্গে টেনিস খেলছে সত্যি আশ্চর্য। বোর্ডিং এর বাগানে বিকেল বেলা জল দেওয়ার ভাব ছিল স্টিফান হোরোর উপরে এবং তার বিনিময়ে সে বোডিং এ ফ্রিতে খেতে পেতো আর থাকতো কিন্তু সবাই দেখলো স্টিফান হোরো আর জল তোলে না। বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল বেচারি টিগগার উপর। সে সকাল বেলা রান্নার কাঠ কাটে আবার বিকালে গিয়ে জল তোলে। টুডু এসে সবাইকে খবর দেয় আজকাল আর হাটে স্টিফান হোরো যাওয়ার সুযোগ পায় না, প্রতি মঙ্গলবার ফাদার লিন্ডনের ঘরে বসে পিলগ্রিমস প্রসেস পড়ে আর ফাদার লিন্ডনের সঙ্গে চা বিস্কুট খায়। সমস্ত ছাত্রদের আলোচনার গবেষণার সীমা পরিসীমার শেষ ছিল না। তারা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না, একদিকে কেমব্রিজের এমএ শিক্ষায় শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিন্ডন অপরদিকে কোন এক জংলি মুন্ডা ডিহির বুড়ো সোখার লড়াইটা ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ লড়াই যেন দুই যুগের লড়াই। বিংশ শতক বনাম প্রাক ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় এই লাঞ্ছনা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না যে, ছেলে ধরা পাদরিরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে এবং খ্রিস্টান করে দিয়েছে। তারই প্রতিশোধ নেবে এই বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য লোভী সুচতুর ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাদের ছেলেকে। ফাদার লিন্ডন তাই আরো বেশি সতর্ক হয়েছে, স্টিফান হোরো যদি আবার জঙ্গলে ফিরে যায় জংলি হয়ে যায় সে পরাজয়ের অপমান বড় বেশি করে বাজবে ফাদারের হৃদয়ে। সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়বে ফাদারের পক্ষে। ফাদার লিন্ডন জানেন সোখা প্রতি মঙ্গলবারে হাটে আসে। একটা আরণ্য আত্ম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা সুযোগের অপেক্ষায়। চা-বিস্কুট খাইয়ে টেনিস খেলিয়ে, সু-সভ্যতার একটি প্রসাদ খাইয়ে স্টিফান হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইলেন ফাদার লিন্ডন।[৬]

কথক ঘোষ এবং অন্য ছাত্ররা এই যুদ্ধকে নাম দিলেন- ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ।’ আর তারা দেখতে লাগলেন এই যুদ্ধে কে হারে কে জেতে। গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সবাই যে যার বাড়ি যাওয়ার ছুটি পেল। টুডু, টিগগা, বেসরা, খালখো ওরা সবাই চলে গেল কারণ ওদের যাওয়ার কোন পথ খরচের দরকার হয় না তাদের লাঠিতে একটা পোটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা ওদের নিজেদের ডিহিতে চলে যায়। পথ খরচ করার মত সামর্থ্যও ওদের নেই। কিন্তু স্টিফান হোরোকে বাড়ি পাঠানো নিয়ে ফাদার লিন্ডন রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন। সবাই দেখলেন সার্ভিস বাসে করে স্টিফান হোরোকে বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে আর নিজের মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করে বাস ভাড়ার টিকিট কিনে দিচ্ছেন ফাদার লিন্ডন। সব ছাত্ররা মিলে বাজি ধরলো স্টিফান হোরো আর ফিরে আসবে কিনা। ইন্দু বললো নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ফাদার লিন্ডন ওর জংলিপনা ঘুচিয়ে দিয়েছে।

দু’বেলা চা-বিস্কুট খাচ্ছে, সেই স্বাদ নিশ্চয়ই ভুলতে পারবে না। ঘোষ বললো ফিরে আসবে না, কারণ এদিকে চা বিস্কুট থাকলেও ওইদিকে চিরকি মুর্মু আছে। কিন্তু ছুটি শেষে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সব ছেলেদের সঙ্গে স্টিফান হোরো বোর্ডিং এ ফিরে এসেছে। সব ছাত্ররা নিরাশ হল। তারা স্টিফান হোরো উপর রাগ করলো, বলল সত্যিই স্টিফান হোরোটা একটা বুদ্ধি-সুদ্ধিহীন বেরসিক। কিন্তু টুডুর কাছে বুড়ো সোখার কথা, স্টিফান হোরোর কথা, চিরকি মুর্মুর কথা শুনে সমস্ত ছাত্রদের মন ভরে গেল। সারা ছুটিটা স্টিফান হোরো তার জঙ্গল আর জংলি জীবনকে একাত্ম করে নিয়েছিল। ইন্দু বলল ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’ বুড়ো সোখার জয় অবধারিত। স্টিফান হোরোর উপরে টুডুর একটা প্রচন্ড রকম শ্রদ্ধা ও মমতা আছে আর সেই কারণে সে কোন কথাই ফাদার লিন্ডনের কানে তোলে না। একদিন টুডু দেখেছিল স্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে ধনুক হাতে স্টিফান হোরো দাঁড়িয়ে আছে। তীর দিয়ে একটা হরিণ শিকার করেছে স্টিফান হোরো। চিরকি মুর্মু পরম স্নেহে স্টিফান হোরোর পা ধুইয়ে দিচ্ছে। টুডু আরো দেখেছে গভীর রাতে চুপিচুপি করে চিরকি তাদের গ্রাম থেকে স্টিফান হোরোর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে। আখড়াতে গিয়ে স্টিফান হোরো মাদল বাজিয়েছে। সেখানে চিরকি নাচ করেছে, সোখা স্টিফান হোরোকে ভালবাসে তাই খ্রিস্টান হওয়ার কারণে কেউ স্টিফান হোরোকে ঘৃণা করে না। টুডু আরো বলে, জংলিদের সাথে মিশে দু’দিন ধরে সেন্ডেরা করেছে স্টিফান হোরো আর টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মতন নেচেছে। শিমুল গাছে আগুন ধরিয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জ্বলন্ত গাছ কেটেছে স্টিফান হোরো। তারপর তার গায়ের ফোসকাতে ঠান্ডা বাতাস লাগানোর জন্য যখন আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় স্টিফান হোরো, তখন আসতে আসতে কাছে এসে চিরকি স্টিফান হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় মাঠে বসে সব ছাত্ররা মিলে যখন টুডুর গান শুনছিল তখন হঠাৎ তারা বোডিং এর বারান্দা থেকে একটা বাঁশির সুর শুনতে পেল। সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তালে তাল দিয়ে মাথা দুলিয়ে টুডু গুনগুন করে গাইতে লাগলো- ‘বাতা মাতা বিরকো তালা/ রে নালো হোম নিরজা/ রাগা ইঙ্গা।’এটা চিরকি মুর্মুর গান বাঁশির সুরে বোর্ডিংয়ের বারান্দায় সুরটা বাজাচ্ছে স্টিফান হোরো। এ গানের অর্থ হল,

> “আমার জোয়ান বন্ধু পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না। চিরকি মুর্মুর এই গানটা সবার অজান্তেই সবার হৃদয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইন্দু চাপাস্বরে তখন আবৃত্তি করতে লাগলো-’শুন শুন হে পরাণ পিয়া…।”[৭]

সবাই মনে মনে বনের লতার মতো না দেখা একটা মেয়েকে, সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলো- তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না, আমরা প্রার্থনা করি স্টিফান হোরো তোমার কাছে যেন ফিরে যায়। সবাই হঠাৎই চমকে ওঠে ফাদার লিন্ডনের গর্জন শুনে, ফাদার লিন্ডন প্রচন্ড রেগে গিয়ে স্টিফান হোরোর বাঁশি ভেঙে দিয়েছে। সেই এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত ছাত্রের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। রাগের মাথায় কথক ঘোষ বলেছিল, ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারল না স্টিফান হোরো। বিমর্ষভাবে টুডু বলেছিল স্টিফান হোরো বড় গোয়ার ফাদারকে এর ফল ঠিক টের পাইয়ে দেবে। কিন্তু স্টিফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু উল্টে গোঁয়ার্তুমি ধরতে দেখা গেল ফাদার লিন্ডনকে। ফাদার লিন্ডন তাঁর অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে বের হন গোপন সফরে। কখনো ভোজপুরি লেঠেল যায় সঙ্গে আবার কখনো বা আট দশটা কনস্টেবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনস্টেবল চলে আসে। যেন এক যোদ্ধার দল নিয়ে দু’দিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যায় ফাদার লিন্ডন। সত্যিই একজন ধর্মযোদ্ধা ফাদার লিন্ডন। শেষ পর্যন্ত টুডুর মুখেই সবাই জানতে পারলো মোরাঙ্গী পাহাড়ে মুর্মুদের ডিহিতে ফাদার লিন্ডন তার অভিযান শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে একটা গির্জা ও তৈরি করে ফেলেছেন ফাদার লিন্ডন। অরণ্যের বুকের ভিতর ঢুকে তিনি লক্ষ বছরের পুরানো বোঙাদের পাথরের বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন। তার খুব বেশিদিন পার হয়নি ঘোষ শুনতে পেল, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। কারা যেন মাটির গির্জাটা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। যে করেছে তাকে সব ছাত্ররা স্বচক্ষে দেখলো। বুড়ো সোখা সেশন জজের আদালতে ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে। বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের রায় সবাই মিলে শুনলো। এত কিছুর মধ্যেও সবাই নিষ্ক্রিয় দেখল স্টিফান হোরোকে, সে বোডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটগাছের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময় অসময়ে দোল খেয়ে যেন গায়ের জ্বালা মেটায়। সারাদেশে যখন ‘অসহযোগ আন্দোলন’ এবং ‘জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে’র তুমুল প্রতিবাদ উঠলো সেই সময় ঘোষসহ বাঙালি ছাত্র ও বিহারী ছাত্ররা স্কুল

ছাড়লো। কিন্তু রাজার ছেলেরা কেউই স্কুল ছাড়ল না। এমনকি খ্রিস্টান ছেলেরাও নয়। বাঙালি ছাত্ররা মিটিং মিছিল করে সবাইকে বাধা দিতে লাগলো, তারা ভাবলো স্টিফান হোরো হয়তো তাদের দলে আসবে, কেননা ফাদার লিন্ডন যেভাবে স্টিফান হোরোকে অপমান করেছে জীবনে আর কোন পাদরি বা সাদা চামড়ার কাউকে সহ্য করতে পারবে না। স্কুলের সামনে সব ছেলেরা জমায়েত করছিল তখন সবাই দেখলো স্টিফান হোরো আসছে। ‘স্বতন্ত্র ভারত কি জয়’। ‘জয় ধ্বনি’ করে সবাই স্টিফান হোরোকে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে এসে, ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল স্টিফান হোরো। পরেশের হাতটা সরিয়ে দিল। নিজের মত স্বভাব সিদ্ধভাবেই ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো স্টিফান হোরো। সেই দিন স্টিফান হোরোকে সব বাঙালি ছাত্ররা ভালো করে চিনলো। আর স্টিফান হোরোকে গালাগালি দিয়ে বললো, পাদরিদের ক্রীতদাস,মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মুর্খ জংলি স্টিফান হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনলি না, একটু শ্রদ্ধাও করলি না। চিনলো শুধু ওই জঙ্গলটাকে, কিন্তু তোর জঙ্গল টাও যে ভারতবর্ষের মধ্যে রে বুনো ষাঁড়, ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়।[৮] ‘আট বছর পরের একদিনে’র কথা।

বাঙালি ছাত্র ঘোষ এখন লেপো থানার দারোগা। সকাল বেলায় কয়েক জন বিরসা পন্থী মুন্ডা থানায় এসেছে হাজিরা দিতে, আজই তারা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। এখানে থানাতে হাজিরা দিয়ে তারপর যে যার নিজের ডেরায় ফিরে যাবে। ‘বিরসাইত’ মুন্ডারা সবার কাছে অত্যন্ত সন্দেহ ভাজন জীব। প্রতিবছর হাঙ্গামা বাধায়, পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। জঙ্গলের আইন মানে না মহাজনকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বাজারে বসলে কোন রকম তোলা দেয় না। জমি জবর দখল করতে গেলে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু’বছর আগে একবার ‘মুন্ডারা বিদ্রোহ’ ঘোষণা করে, তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল করেছিল। তারা সবাই ছিল ভগবান বিরসা মুন্ডার আদর্শে বিশ্বাসী মুন্ডা। পাদরিকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ওরমানঝির জঙ্গলে মুন্ডাদের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ হয়েছিল পুলিশের। সবার শেষে হাজিরা দিতে এসেছে যে লোকটা তার নাম রুননু হোরো। ঘোষ যখন ডায়েরির উপর থেকে চোখ তুলে মুন্ডা লোকটার দিকে তাকালো দেখলো, তার মাথায় জংলি খোঁপাটা যটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলা ফলের মালা, খালিগা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। কিন্তু ওই আদিম সাজ সজ্জার মধ্য দিয়েও এক জোড়া সু-শানিত আধুনিক চোখ ঘোষের দিকে তাকিয়ে আছে। বিষয় চাপতে গিয়েও ঘোষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে ফেলে স্টিফান হোরো। মিষ্টি হেসে লোকটা বলে না না ঘোষ আমি রুননু হোরো। আমি একজন ‘বিরসাইত মুন্ডা’। আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য। বিরসা ভগবান মুন্ডাদের গান্ধীজি ছিল ঘোষ, আমি তাকে চোখে দেখিনি আমার বাবার মুখে তার কথা শুনেছি। ইংরেজদের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদির মত মরে গেছে আমাদের বিরসা ভগবান। তার চেহারা দেখতে কেমন ছিল জানো ঘোষ যিশুখ্রীস্টের মতো। মুন্ডাদের জঙ্গলের বাইরের থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে, তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তার অনুরোধ কি আমরা ভুলতে পারি? দারোগা ঘোষ যখন তাকে স্টিফান হোরো বলে ডাকলো। তখন হোরো প্রতিবাদ করে বললো আমি রুননু হোরো। স্টিফান হোরো নিজের থেকে খুশি হয়ে নানা খবরের সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠীদেরও খবর নিল, ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে? চারদিক ভালো করে দেখে ঘোষ তাকে প্রশ্ন করল তুমি এতো রোগা হলে কি করে স্টিফান হোরো। মৃদুভাবে উত্তর দিয়ে স্টিফান হোরো বলল, আমার টি-বি হয়েছে। যে কথাটা শোনার জন্য ঘোষের মনটা ছটফট করছিল অনেক সংকোচ কাটিয়ে শেষে বলল চিরকি মুর্মু কোথায়? স্টিফান হোরো শান্তভাবে উত্তর দিল ও জানো না বুঝি। ফাদার লিন্ডনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খ্রিস্টান হয়েছে। এখন হাজারীবাগের কনভেন্টে থাকে। বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো চোখের দৃষ্টিটা চিকচিক করে উঠল। তীব্র ফলার মতই। কিন্তু জলে ভেজা চোখে ঘোষ আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারল না। স্টিফান হোরো নিঃশব্দে চলে গেল। কাউকে এ কথা মুখ ফুটে বলতে হয়তো ঘোষের লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো তার মনের মধ্যে বেঁধেছিল। হয়তো তারাই নিরপেক্ষ থেকে ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’ স্টিফান হোরোকে হারিয়ে দিয়েছে। স্টিফান হোরো বনবাসে চলে গেল।[৯]

সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পটির শিরোনাম অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় পানিপথে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং এই তিনটি পানিপথের যুদ্ধে সব ক্ষেত্রেই ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই যুদ্ধে বাবর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবর হিমুকে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিতকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালি মারাঠাদের তথা বালাজী বাজিরাওকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদের প্রতাপ প্রতিপত্তিকে একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিটিয়ে দেয়। পানিপথের প্রতিটি যুদ্ধের পরিনাম সব ক্ষেত্রেই একই, ভারতীয় শক্তির পরাজয় বিদেশি শক্তিদের কাছে। পানিপথের তিনটি যুদ্ধে ভারতীয়দের এই বারংবার পরাজয়ের কারণ ভারতীয় রাজশক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পারস্পারিক বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মনোভাব এবং পানিপথের তিনটি যুদ্ধের সময়ই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সব সময় ভারতীয় অন্য শক্তি গুলি নিরপেক্ষ থেকেছে। গল্পকার সুবোধ ঘোষ তার ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে অনুরূপ এক ঘটনাগত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। একই বোর্ডিং এ পড়াশোনা করার সময় বাঙালি ও বিহারী ছাত্রদের সঙ্গে আদিবাসী এবং মুন্ডা ছাত্রদের কোনরকম বন্ধুসুলভ প্রীতি সুন্দর সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় কিন্তু জাতিগত অভিজাত্যের কারণে তারা পরস্পর একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। স্টিফান হোরোর পরাজয় ঘটেছে খ্রিস্টান ধর্মযাজক ফাদার লিন্ডন সাহেবের নিকট। ভারতবাসী হিসেবে বাঙালি ও বিহারী ছাত্ররা সেদিন স্টিফান হোরোর পক্ষ অবলম্বন করেনি। কথক মিস্টার ঘোষ তাই স্বীকার করে বলেছে-

> “হয়তো আমরাই নিরপেক্ষ থেকে ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’ স্টিফানকে হারিয়ে দিলাম।”[১০]

আদিবাসী মুন্ডারা নির্জন জঙ্গলে বসবাস শুরু করে। বন্য জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক বিপদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হয়। তার উপর তো বহিরাগত হানাদার এবং সরকারি পেয়াদাদের জোর জুলুম লেগেই থাকে। মুন্ডারা স্বভাবতই কৃষিকাজ এবং পশুশিকার করে, ফলমুল আহরণ করে তাদের আহার্য সামগ্রীর চাহিদা পূর্ণ করে। মুন্ডারা প্রকৃতির পূজারী। তাদের নিজস্ব ধর্ম ‘সারনা’ কিন্তু এই ‘সারনাধর্ম’ আজও পর্যন্ত সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। বহিরাগত মিশনারি এবং পাদরিরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে মুন্ডাদেরকে লোভের বসবর্তি করে ধর্মান্তরিত করন শুরু করে দেয়। এমনিভাবেই আইরিস পাদরিদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়ে রুননু হোরো হয়ে যায় স্টিফান হোরো। স্টিফান হোরোকে জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফাদার লিন্ডন বোর্ডিংয়ের চার দেয়ালের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আটকে রাখতে পেরেছিলেন কিন্তু স্টিফান হোরোর মন থেকে জঙ্গলকে কোনদিন ফাদার লিন্ডন মুছে ফেলতে পারেনি। মুন্ডাযুবক স্টিফান হোরোর মনের মধ্যে যে আগুন চাপা ছিল, যে জাতীয়তাবোধের স্ফুলিঙ্গ বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছিল তাতে ঘৃতাগ্নী দান করেছিলেন বুড়ো সোখা। বুড়ো সোখা হলেন মুন্ডাসমাজকে রক্ষাকারী পহান বা প্রধান, তিনি জানেন বহিরাগত অশুভ শক্তি তাদের শান্তির জঙ্গল থেকে শান্তি আশ্রয় থেকে ‘ডাইনদের’ মতো তাদের ছেলেগুলোকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। তাই বুড়ো সোখা পাদরি ফাদার লিন্ডন সাহেবের চোখে একজন সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছিল। স্টিফান হোরো বাকি আদিবাসী খ্রিস্টান ছেলেদের মত নয়। সে স্বাধীন চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ‘রাচির জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ। তারমধ্যেই একমাত্র কালকেউটে ছিল স্টিফান হোরো।’ সে হকি স্টিক ছাড়া নিজের দুটো পা দিয়ে ঘন্টা ধরে বেপরোয়া ভাবে হকি খেলতে পারে। ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পায়। কিন্তু তার পরেও নতুন ক্লাসে উঠে অ্যাডিশনাল ইংরেজি কে ছেড়ে দিয়ে স্টিফান হোরো সংস্কৃত নেয়। নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিডের গাঁথাগুলো আগাগোড়া সম্পূর্ণ নির্ভুল আবৃত্তি করে ফাস্ট প্রাইজ পেল স্টিফান হোরো। ফাদার লিন্ডন উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্টিফান হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর স্টিফান হোরো কে তিনি দারোগা করে দেবেন।

ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনায় যে মুন্ডাদের কোন আগ্রহ নেই, সেই রকম একজন ব্যতিক্রমী মুন্ডা ছাত্রকে ফাদার লিন্ডনের ভবিষ্যতে দারোগা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে আটকে রাখতে পারবে না তার প্রমাণ ঠিক তারপরের দিনই পাওয়া গেল। পরধর্ম বাইবেল ক্লাসে একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে স্টিফান হোরো গিয়ে বসলো। ফাদার লিন্ডনের প্রশ্নের একটা উত্তর দিল না শুধু রুক্ষ গলায় বলেছে- জানিনা স্যার। সংস্কৃত ভাষাতে স্টিফান হোরো একশোর মধ্যে পঁচাত্তর পেয়েছে। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়গুলোতে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টিফান হোরো। মিশনারি বোর্ডিংয়ের সুখ- স্বাচ্ছন্দ বিলাস বৈভব কোন কিছুই আর স্টিফান হোরোকে আটকে রাখতে পারেনি। কারণ স্টিফান হোরোর মনের মধ্যে যে জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গলে ফিরে গিয়ে জঙ্গলের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে শিকার জীবনে নিজেকে মেলে ধরেছে। ঠিক একই ভাবে খ্রিস্টান মিশনারিরা যেভাবে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে আঁটকে

রাখতে পারেনি তাদের চতুরতা দিয়ে। বিরসা মুন্ডা যেমন 'অরণ্যবাসীর কান্না শুনতে পাচ্ছিল' ঠিক তেমন মুন্ডা জংলি জীবন ডাকছিল হোরোকে। বিরসা মুন্ডা, খ্রিস্টান হয়েছিল। মিশনারীদের বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুন্ডাদের 'সর্দার আন্দোলন' থেকে মিশনারিরা যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বিরসা বুঝেছিল যে, এ লড়াই সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই, তারা শাসক। মিশনারি রাও শাসকদের জাত ভাই।

'সাহেব সাহেব এক টুপি হ্যায়' বলে বিরসা চলে আসে। কিন্তু স্টিফান হোরো মোরাঙ্গি পাহাড়ে মুর্মুদের মেয়ে চিরকি মুর্মুকে ভালোবেসে বুরুতে গিয়েছে, সেখানে নাচ গান করেছে। ইলি মদ খেয়েছে পেট ভরে। তবুও সে প্রথম অবস্থায় বোর্ডিং ছেড়ে যায়নি। ফাদার লিন্ডন সাহেবের পোষ মানানোর চেষ্টাকে সে নীরবে সহ্য করেছে। ফাদার লিন্ডন এমনভাবে স্টিফান হোরোকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল সে যেন আর হাটে গিয়ে বুড়ো সোখার সঙ্গে দেখা করতে না পারে।[১১] ফাদার লিন্ডন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সুশিক্ষিত তিনি কিছুতেই কোন এক মুন্ডাডিহির বুড়ো সোখার কাছে 'বিংশ শতক বনাম প্রাক ইতিহাসে'র লড়াইয়ে কিছুতেই হারতে চাইছিলেন না। তিনি আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছেন,যদি স্টিফান হোরো আবার জংলি হয়ে যায় তাহলে এই অপমান তার বুকে দারুন ভাবে বাজবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব জঙ্গলের অন্যান্য আদিবাসী সাঁওতালডিহি ও মুন্ডাডিহিতে পড়বে। ফাদার লিন্ডন যখন স্টিফান হোরো জংলিপনা কিছুতেই ঘোচাতে পারলেন না তখন তিনি তার শেষ ব্রহ্মাস্ত প্রয়োগ করলেন এই 'পানিপথের চতুর্থ যুদ্ধে' জেতার জন্য। ফাদার লিন্ডন একজন অত্যন্ত সুকৌশলী ধর্ম গুরু এবং ধর্ম যোদ্ধা। তিনি জানেন ঠিক কোন সময়ে কোন কাজটা করলে, তার বিজয়ের পথটা সুগম হবে। ফাদার লিন্ডন তার কিছু অনুগামীদের নিয়ে মোরাঙ্গি পাহাড়ে মুর্মুদের ডিহিতে যাতায়াত শুরু করে দিলেন। কারণ ওই পাহাড়ের বনভূমিতেই বাস করে, স্টিফেন হোরোর প্রেমিকা চিরকি মুর্মু। যার জন্য খ্রিস্টান হয়েও স্টিফান হোরো পুনরায় জংলি মুন্ডাতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে একটা মাটির গির্জা তৈরি করে ফেললেন ফাদার লিন্ডন, অরণ্যের বুকের ভিতর ঢুকে তিনি লক্ষ বছরের আদিবাসীদের বিশ্বাস বোঙ্গাদের শিলাময় বেদি গুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন। ততদিনে যুদ্ধের দামামা যে বেজে গেছে তা, মুন্ডাবুড়ো সোখা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনিও 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে'র সর্বাত্মক আঘাত হেনে মাটির গির্জা কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। জংলি জাতির এত বড় স্পর্ধা কোন সুসভ্য ধর্মযাজক এর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সেশন জজের রায়ের ফলে বুড়ো সোখা কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মোরাঙ্গি পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গির্জা নির্মাণ হয়ে গেল।

> "ফাদার লিন্ডনের মিশনে চলে গেল চিরকি মুর্মু। খ্রিস্টান হয়েছে। এখন হাজারীবাগের কনভেন্টে থাকে।"[১২]

মুন্ডাদের জীবনে জঙ্গলই হল তাদের ভারতবর্ষ। জঙ্গলই তাদের নিজস্ব জগত। তাই বাঙালি আর বিহারী ছাত্ররা পিকেটিং করে স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের জয় ঘোষণা করে, মুন্ডা স্টিফান হোরোকে অভ্যর্থনা জানালে সে তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের ক্লাসে গিয়ে বসে। এতদিন ধরে সুসভ্য আর্য ভারতবর্ষে অনার্য মুন্ডা যুবককে সরিয়ে রেখেছিল দূরে। আজকে সুসভ্য ভারতবর্ষের আহ্বান এই অসভ্য মুন্ডার কানে পৌঁছয় না। সে শুধু চেনে ওর ওই জঙ্গলটাকে। ওটাই মুন্ডাদের জগত। যে জগতে তারা বাইরের কারো হস্তক্ষেপ চায় না। আদিম কাল থেকেই মুন্ডাদের লড়াই কিছুতেই থামতে চায় না। প্রথমে তাদের বন্য জীবজন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে তখনও আর্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। তারপর বহিরাগত শ্বেতাঙ্গরা যখন এই অনার্য মুন্ডাদের আধিপত্যের উপর হস্তক্ষেপ করেছে তখনও তাদের বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। কোন সরকারি আইন মুন্ডারা মেনে নিতে চায় না। মুন্ডাদের সমাজের নিজস্ব আইন কানুন আছে, তাদের সমাজের মাথা 'পহান' আছে। তাদের 'ধরতিআবা' বিরসা মুন্ডা আছে। মুন্ডাদের বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখলে সতর্ক করে দেন বিরসা ভগবান । বিরসা যুগে যুগে অবতার হিসেবে মুন্ডাদেরকে রক্ষা করে আসছে। মুন্ডাদের আরো একটি লড়াই ভয়ংকর ভাবে লড়তে হয় তা হল, নিজেদের সঙ্গে নিজেদের লড়াই। সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন আইরিশ ধর্মযাজক ফাদার লিন্ডনের সঙ্গে মুন্ডাদের এই নতুন যুদ্ধ 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে' মুন্ডাদের পরাজয়ের কারণ তৃতীয় শক্তি হিসেবে বাঙালি বিহারী ও অন্যান্য আদিবাসী খ্রিস্টান ছাত্রদের নিরপেক্ষ থাকা। সামগ্রিকভাবে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এই 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ'টি দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের সামগ্রিক মূল্যায়নে আমরা 'ত্রিপাক্ষিক যুদ্ধ' হিসেবে

দেখাতে চাই। এই যুদ্ধের প্রথম প্রতিপক্ষ হল ফাদার লিন্ডন এবং মুন্ডাপ্রধান বুড়ো সোখা। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ হল ফাদার লিন্ডন এবং রুননু হোরো। তৃতীয় পক্ষ হল ফাদার লিন্ডন এবং চিরকি মুর্মুর সঙ্গে রুননু হোরোর প্রেম ও জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াই। এই তিনটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফাদার লিন্ডন প্রবল প্রতিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করেছে, তার ক্ষমতার একাধিপত্ব বিস্তার করেছে। নিষ্ক্রিয় ক্ষমতাহীন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হোরো পরাজিত হয়ে বুড়ো সোখাকে হারালো। স্টিফেন হোরো থেকে রুননু হোরো হয়ে গেল। তার পরিবর্তনের অন্যতম বড়ো কারণ চিরকি মুর্মুকে চিরতরে হারানো। কিন্তু মুন্ডা রুননু হোরো তার জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াই থেকে পিছপা হয়নি, হার মেনে নেয়নি। তাই স্টিফান হোরো আট বছর পরেও সে লড়াই কে চালিয়ে নিয়ে গেছে। রুননু হোরো 'বিরসাইত মুন্ডা' হয়ে গেছে, তাদের জঙ্গলের অধিকারের কেউ হস্তক্ষেপ করলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পুলিশকে পর্যন্ত ছেড়ে কথা বলে না। 'বিরসাইত'রা তাই সবার চোখে অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। জঙ্গলের আইন তারা মানে না, সুবিধাবাদী সুদখোর মহাজনদের পিটিয়ে তারা তাড়িয়ে দেয়। চৌকিদারী কর তারা দিতে চায় না। তারা তাদের বাজারে বসবে কিন্তু বাজারের কোন তোলা কাউকে তারা দেবে না। তাদের জমি জোর করে কেউ যদি দখল করতে যায়, তা সে আদালতের পেয়াদা হোক আর যে হোক। তাকে তারা সহজ ছেড়ে দেবে না। দু'বছর আগে 'মুন্ডারা বিদ্রোহ' ঘোষণা করেছিল। নিজেদের কে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল। তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মিশনারি পাদরিরা তাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে গেলে, তাদেরকে মেরে তাড়িয়েছে। পুলিশকেও মেরেছে তাদের জনজীবনে হস্তক্ষেপ করার জন্য। সমস্ত জঙ্গলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য অনেকগুলো পুল ভেঙে দিয়েছে। ওরমানঝির জঙ্গলে একটা খন্ড যুদ্ধ হয়েছিল মুন্ডাদের সঙ্গে পুলিশদের। মুন্ডারা গ্রেপ্তার হয়েছিল, জেল খেটেছিল কিন্তু তাতেও তাদের আন্দোলন থেমে থাকে না। কারণ তারা বিরসা ভগবানের শিষ্য। ভগবান বিরসা মুন্ডাদের 'গান্ধী' ছিল। মুন্ডাদের ভগবানকে জেলখানায় অন্ধকারে একজন কয়েদির মতো মরতে হয়েছিল। বিরসা মুন্ডার চেহারা ছিল 'যিশুখ্রীস্টে'র মতো। মুন্ডাদের জঙ্গলে বাইরের থেকে অনেক পাপ এসেছে। তাই ভগবান বিরসা মুন্ডাদের সাবধান করে দিয়েছে। তার আদেশ কোন মুন্ডা ফেলতে পারে না। রুননু হোরো ও তাই তার ভগবান বিরসার আদেশ ফেলতে পারেনি। সে জঙ্গলের মধ্যে থেকে পাপকে দূর করার জন্য মুন্ডাদের চিরকালীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।[১৩]

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি যেমন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে, ভারতছাড়ো আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্র ইংরেজ শাসকের চোখের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল। যিশুখ্রীস্ট যেভাবে তার প্রেমময় পবিত্র বাণীর মাধ্যমে, পবিত্রতার মাধ্যমে পাপের সাম্রাজ্য থেকে মানুষকে আত্মত্যাগের মাধ্যমে পুণ্যের পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন। তেমনি মুন্ডাসমাজে 'ভগবান বিরসা' একজন সমাজ রক্ষক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরসা হিন্দু সর্দার, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব সবাইকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিরসা বুঝতে পারে এরাও সমস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে মুন্ডাদের ও ধর্মান্তরিতকরণের পক্ষপাতী ছিল। আদিবাসীরা যে সমস্ত বিদ্রোহগুলো করেছিল তা নিয়ে মিশনারি ও হিন্দুদের সবসময় একটা বিশ্বাস কাজ করতো ওই অসভ্য বুনো কালো লোকগুলো, যারা পাথর-গাছ-মাটি উপাসনা করে তারা কোন মতে, সভ্য জগতের মানুষের মধ্যে পড়ে না। বিরসা মুন্ডা সেটা ধরতে পেরেছিল। আর সমগ্র আদিবাসী তথা মুন্ডা সমাজের কাছে সেটা তুলে ধরে মুন্ডা সমাজের রক্ষাকর্তা বা 'ধরতি আবা' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক এই সময়ই মুন্ডাদের জঙ্গলের রাজত্বের মধ্যে জমি ও ভূমির থেকে মুন্ডাদের উচ্ছেদ করতে, ব্রিটিশ সরকার তাদের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বিদেশি ও ভারতীয় শাসক, বাংলা- বিহারের জমি ও মুনাফালোভী জমিদার, জোরদার,মহাজন, ঠিকাদার বাহিনী, পুলিশ ,উকিল, কোর্ট-কাছারি নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে মালভূমি অঞ্চল থেকে কিভাবে আদিবাসী মুন্ডাদের উৎখাত করা যায়। ব্রিটিশ সরকার এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় জোরদার জমিদারদের এই চক্রান্তের নাড়ির হদিশ একমাত্র বিরসা মুন্ডাই ধরতে পেরেছিল। 'এই সময়ের নাড়ি' বিরসা মুন্ডা ছাড়া আর কারো পক্ষে ধরা সম্ভব ছিল না, এই কারণেই 'বিরসা মুন্ডা', মুন্ডা সমাজের 'ধরতিআবা'। মহাশ্বেতা দেবীর মতে ও বিশ্বাসে, 'বিরসা মুন্ডা Modern Man' বা আধুনিক মানুষ। বিরসা মুন্ডা তার জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি, চেতনাবোধ, বিবেকবোধ অনুযায়ী আদিবাসি তথা মুন্ডাদের কে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিল। আর বিশ্বমানব সমাজকে, আদিবাসিদেরকে জল, জঙ্গল, জমিন ও পরিবেশ রক্ষারসেনানি হতে বলেছিল।[১৪]

সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’ ফাদার লিন্ডনের মন ও মানসিকতার নাড়িকে ধরতে পেরেছিল বুড়ো সোখা এবং স্টিফান হোরো। বুড়ো সোখা বুঝতে পেরেছিল ফাদার লিন্ডন তাদের ছেলেকে জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মুন্ডা থেকে খ্রিস্টান করে দিয়েছে। তাই সে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারেনি। কারণ সে জানে মিশনারি পাদরি ‘ডাইনরা’ যদি এইভাবে জঙ্গল থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টান করে প্রাসাদের মধ্যে বন্দি করে, তাহলে মুন্ডাদের জঙ্গলের অধিকার আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। একদিন মুন্ডাসমাজ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন আর কেউ দুঃখ কষ্টের মধ্যে মুন্ডা হয়ে থাকতে চাইবেনা, সুখ ভোগের জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাবে। তাই বুড়ো সোখা তাদের ‘নিজেদের ভারতবর্ষ’কে তাদের ‘জঙ্গলকে’ বাঁচানোর জন্য বারবার স্টিফান হোরোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে গেছে তাদের জঙ্গলের কাছে, তাকে চেনাতে চেয়েছে তার প্রকৃত সত্তাকে, প্রকৃত জীবনকে। কিন্তু বুড়ো সোখা কিছুতেই বুঝতে পারেনি, মুন্ডাদের এই নতুন সংকট ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধের’ প্রতিপক্ষ ছেলেধরা পাদরিরা শুধুমাত্র ধর্মযাজক নয়। তারা বিপুল ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী। যা দিয়ে সমগ্র জঙ্গল টাকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করতে পারে। কিন্তু বিপুল ক্ষমতাশালী ফাদার লিন্ডনের প্রতিপক্ষ হয়ে শেষ পর্যন্ত বুড়ো সোখা যুদ্ধটা চালিয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়েছে। লড়াইয়ের ময়দানে একটুখানি জায়গায়ও কখনো বুড়ো সোখা ফাদার লিন্ডনকে ছেড়ে দেয়নি। সে প্রতিটি পদক্ষেপে ফাদার এর থেকে এগিয়ে ছিল। তাই। ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’র সেনাপতি হিসেবে মুন্ডাবুড়ো সোখা সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবে। অন্যদিকে ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে’র গল্পের নায়ক তথা জঙ্গলে রক্ষক ও বিরহী প্রেমিক মুন্ডা রুননু হোরো, ফাদার লিন্ডনের মন মানসিকতা ও নাড়ীর গতিকে চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু স্টিফান হোরো যতটা কল্পনা করেছিল ফাদার লিন্ডন তার থেকে চতুর্গুণ এগিয়ে ছিল। ফাদার লিন্ডন যখন জানতে পেরেছিল স্টিফান হোরো মোরাঙ্গি পাহাড়ে যায়। বুরুতে যায় মদ খেয়ে তার স্বজাতির সঙ্গে নাচ গান করে। মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুর্মু ডিহিতে একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ফাদার লিন্ডন স্টিফান হোরোর উপর তার আক্রোশকে সংযত করেছে। তিনি চেয়েছিলেন স্টিফান হোরোকে তার কাছে রেখে ভালোবাসা দিয়ে, কিছু খাবার খাওয়ালে হয়তো সব ভুলে যাবে। ফাদার লিন্ডন যখন বুঝতে পারলেন স্টিফান হোরো খ্রিস্টান থেকে আবার জংলি আদিবাসী হয়ে যাচ্ছে, স্টিফান হোরোর প্রভাব যেন অন্য আদিবাসী খ্রিস্টান ছাত্রদের মধ্যে না পড়ে সেই জন্য সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ যেন স্টিফান হোরোর সঙ্গে না মেসে। মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখার সঙ্গে দেখা করার পথ বন্ধ করে দিয়ে, স্টিফান হোরোকে তার কাছে রেখে দিয়েছেন। টেনিস খেলা করেছেন একসঙ্গে, গুড ফ্রাইডের ছুটিতে বাসের টিকিট এর টাকা দিয়ে স্টিফান হোরোকে বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাতেও যখন স্টিফান হোরোর মন থেকে সম্পূর্ণ বনকে উচ্ছেদ করা যায়নি তখন তার শেষ অস্ত্র ফাদার লিন্ডন ব্যবহার করেছেন। মোরাঙ্গি পাহাড়ে গিয়ে মুর্মুদের ডিহিতে গির্জা নির্মাণ করেছেন। মুর্মুদের লোভ-লালসার বশবর্তী করে মেয়েটাকে খ্রিস্টান করে হাজারীবাগের কনভেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। যার প্রেমের টানে স্টিফান হোরো আবার জংলী জীবন কে বেছে নিয়েছিল, থানার দারোগা হওয়ার মতো লোভনীয় প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। স্টিফান হোরোই সেই প্রেমিকা যখন তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে, খ্রিস্টান হয়ে যায় তখন সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। এরপর থেকে আর হোরো, স্টিফান হোরো থাকেনি। সে তার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে মুন্ডা রুননু হোরো হয়ে, জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। মুন্ডাদের ‘অরণ্যের অধিকার’ আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে, লড়াই করেছে, জেল খেটেছে। মারণ রোগ বুকে করে জঙ্গল রক্ষার দায়িত্বকে নিজের কাজে নিয়েছে। মুন্ডাদের চিরদিনের জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াই নতুনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর তার নেতৃত্ব দিচ্ছে ভগবান বিরসার সুযোগ্য আনুগামি হয়ে।[১৫]

সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে আইরিশ ধর্মযাজকদের চক্রান্ত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী মুন্ডাদের যে অসম যুদ্ধের কথা আদান্ত গল্পে বর্ণিত হয়েছে, লেখক সেই অঘোষিত যুদ্ধকে ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইতিহাসে তিনটি পানিপথের যুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় প্রবাল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে ভারতীয় অন্যান্য তৃতীয় শক্তিশালী শক্তি গুলি সবসময়ই নিরপেক্ষ থেকেছে, যার ফলে প্রতিবারই বিদেশী শক্তির কাছে দেশীয় শক্তিগুলির পরাজয় ঘটেছে। সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথে যুদ্ধ’ গল্পে আইরিশ ধর্ম যাজকদের কাছে আদিবাসী মুন্ডারা পরাজিত হয়েছে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বাঙালি, বিহারী ও অন্যান্য আদিবাসী ছাত্ররা নিরপেক্ষ

থাকার কারণে। পানিপথের তিনটে যুদ্ধে প্রভাবশালী তৃতীয় পক্ষের নিরপেক্ষতার সঙ্গে মুন্ডাদের সংগ্রামে বাঙালিদের নিরপেক্ষতার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে দেখিয়েছেন গল্পকার আমাদের। মুন্ডাদের কাছে এ লড়াই নতুন। মুন্ডারা বুঝে গেছে যে লড়াই তাদেরকে একাই লড়তে হবে। আপাত ভাবে মুন্ডারা লড়াইটা হেরে গেলেও তাদের জঙ্গলের অধিকার রক্ষা লড়াই থেকে তারা কখনোই পিছপা হননি। মুন্ডাদের কাছে এ এক নতুন সংকট ‘পানিপথের যুদ্ধ’, তাদের জঙ্গলকে বাঁচানোর লড়াই। মুন্ডারা তাদের ‘ভারতবর্ষে’ কখনোই তারা বহিরাগত শক্তির অনুপ্রবেশকে মেনে নেবে না।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তবিংশ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৪২৭ পৃ: ৭।
২. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9F_%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
৩. ঘোষ, সুবোধ। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৩৫৬ ,পৃ: ৬১- ৬৩।
৪. তদেব, পৃ: ৬৪-৬৫।
৫. তদেব, পৃ: ৬৬-৬৮।
৬. তদেব, পৃ: ৬৯-৭০।
৭. তদেব, পৃ: ৭১।
৮. তদেব, পৃ: ৭২।
৯. তদেব,পৃ: ৭৩-৭৫।
১০.(শেঠ) মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা। পুরকাইত উত্তম। সম্পাদক, সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক শিল্পী, ব্যর্থ পাণিপথের বিরহী নায়ক, প্রকাশক উজাগর, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ: ১৪৪।
১১. তদেব, পৃ: ১৪৫-১৪৬।
১২. তদেব, পৃ: ১৪৭-১৪৮।
১৩. তদেব, পৃ: ১৪৯-১৫০।
১৪. তদেব, পৃ: ১৫১-১৫৫।
১৫. ঘোষ, সুবোধ। ভারতের আদিবাসী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৮, পৃ: ২২২-২৬৬।

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, সুমিতা। ইতিহাস থেকে উপন্যাস: একটি জিজ্ঞাসা (প্রসঙ্গ অরণ্যের অধিকার)কোরক। মহাশ্বেতা সংখ্যা, বইমেলা, ১৯৯৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। ঘোষ, সোহিনী। সম্পাদক, অরণ্যের অধিকার এবং চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ: একটি তুলনামূলক আলোচনা। মহাশ্বেতা দেবীর, অরণ্যের অধিকার। বাস্তবতার সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, ২০০৫
৩. মিদ্দে, সুরঞ্জন। সম্পাদক, সাঁওতাল মিশনারি। নান্দনিক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২
৪. নন্দী, রতনকুমার। সম্পাদক, অরণ্যের অধিকার। মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, গান্ধী জয়ন্তী ২০০৫
৫. সেন্দেল, ভেলামভান। বল, এলেন। সম্পাদক, বাংলার বহু জাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতি প্রসঙ্গ। প্রকাশক আইসিবিএস দিল্লি, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৮
৬. গোলদার, অনিমেষ। সম্পাদক, সুবোধ ঘোষের নির্বাচিত গল্প পাঠপ্রতিক্রিয়া। দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ ১৪২৯
৭. মিদ্দে, সুরঞ্জন। বাংলা উপন্যাস কথা। একুশ শতক, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০২২
৮. বাস্কী, পুণ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল। ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০
৯. রায়, পি.কে.। আপোষহীন মুক্তিযোদ্ধা বিরসা মুন্ডা। বোধিসত্ত্ব পাবলিশার, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ২০১৯
১০.মণ্ডল, অমলকুমার। ভারতীয় আদিবাসী। দেশ প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, নভেম্বর, ২০২২
১১. দেবী, মহাশ্বেতা। সাহা, পৃথ্বীশ। অনুবাদ, ভেরিয়ার এল্যুইন, আদিবাসী জগত, সাহিত্য অকাডেমী, কলকাতা
১২. আচার্য, অনিল। সম্পাদক, অনুষ্টুপ, আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা। বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৪, প্রাক-শারদীয় ২০২২